চৈতি হাওয়া

সামিয়া খান প্রিয়া

তাম্রলিপি

চৈতি হাওয়া
সামিয়া খান প্রিয়া

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি : ৭২৩

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
হা তাবাসসুম

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
ইন্টারনেট প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৩৮০.০০

Choiti Hawa
By : Samia Khan Priya
First Published : February 2023 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 380.00 $10

ISBN : 978-984-97605-3-5

উৎসর্গ

সামিয়া খান প্রিয়াকে।
চৈতি হাওয়া লেখার সময় ভীষণ যুদ্ধ করেছিলে তুমি।
সেই স্মৃতিটা আজীবন মনে রেখো।

ভূমিকা

আমরা মাঝেমধ্যে অনুভূতির জন্য ভীষণ জটিল সমস্যায় পড়ে যাই। যা থেকে বের হওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। চৈতি হাওয়া বইটিও সে রকম। ভুলে ভরা কতগুলো মানুষ নিয়ে। কারো জীবনের সঙ্গে মিলে গেলে বিষয়টি নিছক কাকতালীয়।

শুকনো বকুলগুলো সুতোর বাধন ছিঁড়ে ছন্নছাড়া হয়ে ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল। তড়িৎ গতিতে জেবা সেগুলো সামলে নিতে ব্যস্ত। পশ্চিম দিক হতে আগত শীতল সমীরণের ছোঁয়ায় সে থেমে গেল। বছরের প্রথম বারিধারা নিজ আগমনের বার্তা জানান দিচ্ছে। জেবার জীবনে বৃষ্টির সঙ্গে বিষাদ জড়িয়ে আছে বহুকাল হতে। আজও ব্যতিক্রম নয়। ঠোঁট কামড়ে কান্না সংবরণের বৃথা চেষ্টার ক্ষণকাল বাদে বিচ্ছিন্ন বকুলগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আয়নায় সামনে গিয়ে নিজেকে সাজিয়ে নিল একটু। গায়ের রঙটা কালো বটে তার। তবে নিজ সৌন্দর্যে সুন্দর সে। দরজায় করাঘাত হলে গলার আওয়াজ উঁচু করে শুধাল, "আমি প্রায় তৈরি তহুরা। বারবার আসতে হবে না।"

"আচ্ছা। জলদি এসো আপু। ভাইয়ারা এসে গিয়েছে।"

মুখ বিকৃত করল জেবা। দৃষ্টি বাষ্পকূল হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ হলো তার। মৃদু কণ্ঠে নিজের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

"এমন ভাব করছে যেন আজ প্রথম দেখতে এল। আজ উল্টোপাল্টা কিছু বললে সোজা বাসা থেকে বের হয়ে যাব।"

চুলগুলো হাতখোঁপা করে বাহিরের ঘরে এল জেবা। তিনজন মধ্য বয়স্ক পুরুষ সেখানে বসে উচ্চসুরে হাসছে। জেবা উষ্ণ শ্বাস ফেলল। ভাব বিনিময় করে দ্রুত গতিতে রান্নাঘরের পানে অগ্রসর হলো। ভাগ্যিস হবু স্বামী নামক মানুষটা ছিল না এখানে।

"কী করো মা?"

জুঁই ক্লান্ত ভঙ্গিতে কপালের ঘাম মুছে নিল। অন্যদিন সে এসব রান্না কাজের লোকদের দিয়ে তৈরি করে নিলেও আজ ভিন্ন কথা। পূর্বের সম্পর্কের থেকেও বেশি ও বাড়ির লোকজন এখন মেয়ের সাথে জুড়ে গিয়েছে হাজার হোক হবু বেয়াইন বাড়ি বলে কথা।

"এই তো রান্না শেষ। এখন গুছাতে দিব। উমাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?"

"নাহ আম্মু।"

"তহুরার সঙ্গে দুটো ভাই ছাদে গিয়েছে। দেখা করা উচিত ছিল তোমার।"

"হুঁ।"

"যাও খাবারগুলো টেবিলের ওপর গিয়ে রাখো।"

জেবা একে একে সব খাবার টেবিলের ওপর নিয়ে রাখল। ক্ষণবাদে সকলের সঙ্গে ডায়নিং টেবিলে দেখা হয়ে গেল তার। কুশল বিনিময় করে মাকে সাহায্য করতে লাগল জেবা। উমাইয়ের সঙ্গে ঠিক কয়দিন পর তার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বোঝাপড়া একদম নেই বললে চলে। এইতো দুজনের দেখা হলো, দৃষ্টির মিলন হলো কিন্তু বাক্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে দুটো প্রাণ কত অচেনা?

বেশ দৌড়েই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে জেবা। ওদিকে আকাশ যেন দুঃখভরা অভিমানে টইটম্বুর হয়ে আছে। যেকোনো সময় অজস্র অশ্রুকণা দিয়ে পৃথিবীর আনাচকানাচে সিক্ত করে তুলবে। পদচারণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জেবার মস্তিষ্কে বিভিন্ন প্রশ্নও চলছে। নিজের সহিত নানা কথা বলছে সে। দুপুরে কোনোমতন বাসা থেকে বের হয়ে এসেছে। এমনকি ঘরের জুতোজোড়া অবধি পরিবর্তন করেনি। ওসময় অবশ্য এতকিছু খেয়াল ছিল না তার। উমাইয়ের বিয়ের জন্য সকলের সামনে ওভাবে না করায় জেবার শরীরে যেন আগুন লেগে গিয়েছিল। ত্বকে কী তীব্র এক যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। তার ওপর মায়ের সেই বিদঘুটে চাহনি। রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়েই জেবা হতাশামূলক একটি শব্দ বের করল মুখ দিয়ে। হাতে তার সাধারণ মান্ধাতা আমলের একটি ঘড়ি। সে যখন ক্লাস ফাইভে ছিল তখন তার দাদা কিনে দিয়েছিল। আশ্চর্যভাবে যন্ত্রণটা এখনও পূর্বের মতো সঠিক সময় বলে দেয়। জেবা তখন দশ বছরের ছোট্ট মেয়ে ছিল। এখন চব্বিশ বছরের যুবতী। আধুনিক কালের নানা চাকচিক্যময়েও এই ঘড়িটাকে পরা বাদ দিতে পারে না সে। হাতটা উল্টো করে সময় দেখে নিল। এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। সকাল থেকে না খেয়ে আছে সে। নিজের পার্সটা সঙ্গে করে নিয়ে না আসার জন্য বড় আফসোস হলো তার।

এলাকার এদিকটায় পরিচিত এক রেস্টুরেন্ট রয়েছে জেবার। নাম হলো "তিব্বতি চা"। অথচ এখানে চা বাদে ভিন্ন সব পাওয়া যায়। জায়গাটির এহেন নাম সকলের কাছে এক ধাঁধা। বৃষ্টি নামায় রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়ল জেবা। একটু আধটু ভিজে গিয়েছে সে। একটা বেঞ্চের ওপর বসল গিয়ে। আশেপাশে বেশ কোলাহল। এখানকার কলিজার শিঙাড়াগুলো খেতে ভালোই আছে। কামড় দিলে জিহবার মধ্যে ফ্লেভারগুলো জোরে জোরে আঘাত করতে থাকে। এসব অদ্ভুত উপমাগুলো জেবা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। পাছে কেউ এসব শুনে হেসে ফেলে। এমন সময় কমলাকান্তের দপ্তরের সেই মার্জার সুন্দরীর দৃশ্যের মতোন পাশ থেকে কেউ বলে উঠল ম্যাও। চট করে পাশে তাকাল জেবা। একটা ক্যালিকো ক্যাট তার পাশে বসে আছে। একটু জোরেই জেবা বলে ফেলল,

"এটা তো সেই বেয়াদব বিড়ালটা।"

বিড়ালের মালিক তাসবীর কাছেপিঠেই ছিল। খুব সম্ভবত শিঙারা আনতে গিয়েছিল। জেবার কণ্ঠস্বর শুনে তার দিকে ভয়ংকর এক দৃষ্টিতে তাকাল। অবশ্য কিছু বলল না। চুপচাপ বেঞ্চের এক পাশে বসে বিড়ালের উদ্দেশ্যে বলল,

"জাম্বু ধর তোর জন্য লেগ পিস।"

বিড়ালের সামনে লেগ পিসটা রেখে নিজে শিঙাড়া খেতে লাগল তাসবীর। জেবা ছেলেটার দিকে পিটপিট করে চেয়ে আছে। গলাটা একটু পরিষ্কার করে শুধাল,

"আপনারা চলে এসেছেন বাসা থেকে?"

"তো আসবো না? এত কৃপণ তোমরা। দুপুরে কী খেতে দিলে পেটই ভরেনি আমাদের।"

কথাটি সর্বপ্রথম জেবার বোধগম্য হলো না দেখে পুনরায় জিজ্ঞেস করল,

"মানে?"

তাসবীর জবাব দিল না। আপনমনে নিজের খাওয়া শেষ করতে লাগল। পাশে বসে ছোট্ট জাম্বু নামক বিড়ালটাও কত তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছে। সাধারণ ফর্মালিটি করেও জেবাকে একটুও সাধলো না তাসবীর। রাগ করে মেয়েটা চুপচাপ বসে রইল। তাসবীরকে সে বড় ভাইয়া বলে ডাকে উমাইয়ের সুবাদে। তার হবু বর উমাইয়ের আপন চাচাতো ভাই হচ্ছে

তাসবীর। আজকে জেবার বাসায় তাদের সকলের পরিবারসহ দাওয়াত ছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল উমাইয়ের ও জেবার বিয়ে নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু সবটা কেমন নষ্ট হলো উমাইয়ের কথায়। সে হঠাৎ জেবার সঙ্গে তার প্রেমিকার তুলনা করে বসল। জিনিসটা খুব অপমানজনক ছিল মেয়েটার জন্য। তাই তো কোনোকিছু না ভেবে তৎক্ষণাৎ বাসা থেকে বের হয়ে এসেছে। আচমকা জেবা বলল,

"জানেন আমাদের বাসায় আজ কতকিছু রান্না হয়েছিল? সেসব খেয়েও কীভাবে আপনি এখন এত খাবার খাচ্ছেন?"

তাসবীর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, "সেসব খাবার তো তোমরা সিন্দুকে তুলে রেখেছিলে। বিশ্বাস করো ফর্মালিটি করে না বলার পর যে দ্বিতীয়বার তাকে সাধতে নেই এই প্রথম আমি জানলাম। টেবিলে এতো খাবার থাকা সত্ত্বেও আমার প্লেটে চড়ুইপাখির দানা ছিল।"

জেবা হা হয়ে গেল। সে দেখেছিল দুপুরবেলা তাসবীরের প্লেটে তার ছোট বোন তহুরা একের পর এক খাবার তুলে দিচ্ছে। এরপরেও এমন অভিযোগ কীভাবে করল ছেলেটা?

"আপনি এত মিথ্যাবাদী? কতোগুলো খাবার খেলেন।"

তাসবীর চোখ তুলে তাকাল জেবার পানে। ছেলেটা কঠিন চেহারার অধিকারী। সাধারণ কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে এহেন দৃঢ়তা সহ্য করা কঠিন।

"তুমি আমার খাওয়া গুনছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কী খারাপ মেয়ে তুমি? এজন্যই জাম্বু দেখতে পারে না।"

"এই গোলআলু মার্কা বিড়াল আমাকে না দেখতে পারলে কিছুই যায় আসে না আমার।"

তাসবীরের মনে হচ্ছিল খুন করে ফেলবে জেবাকে। পরবর্তীতে নিজেকে শান্ত করে বলল, "উমাইয়ের তোমাকে বিয়ে করতে চায় না।"

দীর্ঘশ্বাস ফিরে এল জেবার। ক্ষুদ্র করে জবাব দিল, "জানি।"

"তবে চাচা মানছে না। সেও তোমাকে বাড়ির বউ বানিয়ে ছাড়বে।"

"এটাও জানি। আমার মা নিজেও বিয়েটা শেষ অবধি দিয়েই ছাড়বে।"

"এখন কী করবে?"

"এটা জানি না।"

তাসবীর নিজের খাবার শেষ করে বলল,

"বাসায় যাও জেবা। সন্ধ্যা হচ্ছে।"

"বৃষ্টিও তো নেমেছে। থেমে যাক। চলে যাব। এখন ভিজে ভিজে যাব না।"

"ভিজে গেলে মরে যাবে না।"

পাশ থেকে জাম্বুকে ছোট্ট একটা রেইনকোট পরিয়ে দিল তাসবীর। বিড়ালটি তার সব সময়ের সঙ্গী। এবং তার খুব ভক্তও। নিজেও একটা রেইনকোট পরে নিল। জেবা হুট করে বলে ফেলল,

"আপনার রেইনকোটটা দেওয়া যাবে?"

"না।"

"বৃষ্টিতে ভিজলে সমস্যা হয় আমার।"

তাসবীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

"ফাইন। ধরো নাও। তবে ফেরত না দিলে দ্বিগুণ দাম দিতে হবে। একটা আঁচড় লাগলে জরিমানা দিতে হবে।"

জেবা তার ছোট্ট দেহে রেইনকোটটি জড়িয়ে নিল। তাসবীরের ওই বিশাল দেহের মতো জিনিসটাও বিশাল। জেবাকে বেশ হাস্যকর লাগছে। তাসবীর জাম্বুকে ইশারায় নিজের পেছন পেছন আসতে বলল। অকস্মাৎ বিড়ালটি জেবার ওপর নিজের নখ দিয়ে ভালোবাসা দেখিয়ে দৌড়ে গাড়িতে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাসবীর গাড়ি স্টার্ট করল। রাগে দুঃখে বেশ জোরেই মেয়েটা বলল,

"কুত্তার বাচ্চা বিলাই।"

পরক্ষণে নিজের এহেন সম্ভাষণে হো হো করে হেসে উঠল। অনেকটা ক্ষণ পর নিজেকে হালকা অনুভব হচ্ছে তার। হাসি থামিয়ে উষ্ণ শ্বাস ফেলল। গম্ভীরতা তাকে জাপটে ধরেছে। ফিসফিস করে নিজের সঙ্গে বলতে লাগল,

"আমার থেকে নাকি তার প্রেমিকা বেশি সুন্দর এবং যোগ্যতাসম্পন্ন। সে আমার হবু স্বামী। হয়তো কয়েকদিন পর তার সাথে সারা জীবনের অটুট এক বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। অথচ লোকটার অন্তঃকরণে তিল পরিমাণ স্থানেও জেবা নামক মেয়েটির স্থান নেই। তাহলে মিছিমিছি কর্পূরের পেছনে ছুটে চলেছি আমি? হ্যাঁ সবটাই তো নিছক স্বপ্ন। উহু, স্বপ্ন নয়। এগুলো দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি। বাবার প্রতি দায়িত্ব আর মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি।"

বিশ মিনিট পর জেবা বাসায় এল। তাসবীরের রেইনকোট তার কাজে লাগেনি। সে একেবারে ভিজে চুপসে গিয়েছে। জেবাদের বাড়ি

দেখে তাদের আহামরি ধনীই বলা চলে। অর্থ সম্পদের কোনো অভাব নেই। তার বাবা সজীব শেখ ও মা জুঁই দুজনেই ব্যবসায়ী। সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে অর্থের পাহাড় গড়েছেন। তাদের সবই আছে শুধু একটি পুত্রসন্তান বাদে। এ নিয়ে জুঁইয়ের যেন আফসোসের শেষ নেই।

জেবার তখন চলে যাওয়ায় বেশ রেগে আছে ভদ্রমহিলা। আর সে রাগলে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনে। বাড়িতে ঢুকেই গান শুনতে পেল জেবা।

"জেবা দাঁড়াও ওখানে।"

জুঁইয়ের মুখখানা দেখেই নিজের অর্ধেক জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলল জেবা। শুকনো একটা ঢোঁক গিলল। মায়ের মতো এত সুন্দর না সে। যদি সুন্দরী বলে কাউকে জানে সকলে তবে সে হলো জেবার বোন তহুরা। মেয়েটা তাসবীরের মতো ভয়ংকর সুন্দর। তাদের নামও কেমন ত এর মিল আছে। এমনকি তাসবীর যখুনি বাসায় আসে তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তহুরার সঙ্গে বসে আলাপ করে। নিশ্চয় মেয়েটাকে পছন্দ করে সে। জিনিসটা ভাবতেই জেবার মনে ঈষৎ হিংসার রেখা উদয় হলো। তার ভাবনায় আঘাত হানল জুঁই। মহিলার চোখ দুটো রাগে রক্তিম হয়ে আছে।

"আজকে তখন ওভাবে চলে গেলে কেন?"

জেবা আস্তে করে বলল,

"কথাগুলো শুনে খারাপ লাগছিল আমার।"

"অন্য রুমে চলে যেতে তাহলে। এর বদলে বাসা থেকেই চলে গেল? হাত দাও।"

"মা।"

"হাত দাও বলছি।"

জেবা ভয়ে ভয়ে হাত এগিয়ে দিল। জুঁইয়ের এক হাতে ছোটবাঁশের কঞ্চি ছিল। সেটা দিয়ে কষিয়ে আঘাত করল জেবার হাতে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

"না আছে চেহারা, না আছে গুণ। তবে অহংকার একদম বাবার মতো। আজকে সকলের সামনে অপমান করার সাহস আজীবনের নামে মিটিয়ে দিচ্ছি।"

জুঁই ইচ্ছামতো আঘাত করল জেবার হাতে। কাজের লোকেরা নিজেদের হাতের কাজ ফেলে বিষয়টি দেখতে লাগল। ওদিকে চুপ করে সব আঘাত সহ্য করে নিচ্ছে জেবা। সামান্য টু শব্দটিও করছে না মুখ দিয়ে। তার ধারণা চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেলেও মা মেরে ধরে শাসন করার অধিকার রাখে। জুঁইয়ের মনের শান্তির জন্য সে একটু কষ্ট সহ্য করতে রাজি।

তুলির মাথায়, আলতো রঙ মেখে শুভ্র কাগজে আঁচড় কাঁটল। নীল রঙটা এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষিপ্র গতিতে হিয়ার হাত দুটো কাঁপছে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে যেন ঠিকমতো ছবিটা আঁকতে পারে। কিন্তু অনবরত কম্পনের ফলে রঙগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে কাগজে। আচমকা তার হাত দুটো আঁকড়ে ধরল উমাইয়ের। নরম হাতে আঁকতে লাগল নীল রঙা আকাশ। চট করে তার দিকে তাকাল হিয়া। মেয়েটির অবাক হওয়ার চাহনির বিপরীতে উমাইয়ের মিষ্টি করে হেসে বলল,

"হঠাৎ এত অবাক হলে যে?"

"তুমি কখন এলে?"

"অনেকক্ষণ হলো। তোমার ছবি আঁকা দেখছিলাম।"

"ছবি আর আঁকছি কোথায়। দেখো সবটা কেমন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তুমি ধরার পর যা ঠিক হলো।"

আসলেও হিয়ার ছবিখানা পুরোটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যেন কাগজের উপর এইমাত্র ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল।

"উহু, সুন্দর হচ্ছে। এখানে সাদা রঙটা দিতে পারো।"

হিয়া পরামর্শ গ্রহণ করল না। তুলিটা এক পাশে অনাদরে ফেলে রেখে বলল, "বাসায় এত বেশি এসো না উমাইয়ের। আঙ্কেল পছন্দ করে না।"

"বাবার সব কথা এত মানতে পারব না আমি।"

"সত্যি?"

"একদম।"

হিয়ার মা তামিমা কাছেপিঠে ছিল। সে কথাটা শুনে মাঝখান থেকে বলে উঠল,

"তোমার বাবার কথাগুলোকে কি নিজের জীবনের দৈববাণী মনে করো না? তুমি এমন মানুষ যে সম্পর্ক করলে ঠিকই অথচ বিয়ে করতে পারবে না।"

তামিমার কথাগুলো শুনে উমাইয়েরকে বেশ বিরক্ত দেখা গেল। নেহাতই ভদ্রতার খাতিরে হেসে উড়িয়ে ফেলল খারাপ লাগাটা। টেবিলের ওপর ফোনটা রেখে বলল,

"কী যে বলেন না আপনি আন্টি।"

"ঠিক কথাই বলেছি। বাবা মরা মেয়েটা রূপে, গুণে, যোগ্যতায় কোনো অংশে কম না। শুধু অসুস্থতার বাহানা ধরে তোমার মা-বাবা যা করছে।"

তামিমার গায়ের রঙ কিছুটা ময়লা হলেও দুঃখ পেলে তার মুখটা লাল হয়ে ওঠে। হিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

"এসব কথা বাদ দাও মা। একটু কফি বানিয়ে নিয়ে এসো।"

"এত বাদ দেওয়া যায় না। মা তো খারাপ লাগে।"

ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদতে কাঁদতে তামিমা রান্নাঘরে চলে গেল। উমাইয়েরকে এখন কিছুটা লজ্জিত দেখা যাচ্ছে। হিয়ার হাত দুটো অকারণে সর্বক্ষণ কাঁপতে থাকে। এটা তার জন্মগত রোগ। নিজের হাতের উপর নরম কিছুর আভাস পেল উমাইয়ের। হিয়া তার হাত দিয়ে আরো শক্ত করে ধরল তাকে।

"জেবাকে কালকে ওভাবে অপমান করা ঠিক হয়নি তোমার।"

"যা সত্য তাই বলেছি আমি।"

"আমাকে যখন তোমার বাবা প্রতিবন্ধী বলে তখন কেমন লাগে জানো? সে রকম তো জেবারও লাগে। একটা ব্যাপার বুঝলে উমাইয়ের। এই পৃথিবীতে সকল মানুষের একই দুঃখ। তবে তা ভিন্ন ভিন্নভাবে।"

"এত পয়েটিক কথাবার্তা কোথায় শিখলে?"

"তোমার থেকে।"

উমাইয়ের মাথায় টোকা মারল হিয়া। ছেলেটাও বিপরীতে তার নাকটা চেপে দিল। পরক্ষণেই তারা অট্টহাসিতে মেতে উঠল। দূর থেকে তাদের ওভাবে দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল তামিমা। মেয়ের জন্য শক্তও হতে পারছে না ভদ্রমহিলা। কফি করে তাদের সামনে রেখে ভদ্রমহিলা দূরে সরে গেল। উমাইয়ের বলিষ্ঠ যুবক। দোহারা গায়ের রঙ হওয়ায় তাকে দেখতে বেশ লাগে হিয়ার নিকট। উষ্ণ শ্বাস ফেলল মেয়েটি।

"উমাইয়ের শুনেছ কাল আমাকে মৃদুল ভাইয়া দেখা করতে বলেছেন।"

"বিশেষ কারণ?"

"তিনি হয়তোবা আমাকে পছন্দ করেন।"

"তবে দেখা করার দরকার নেই।"

হিয়া মৃদু হাসল। কফির মগটা টেবিলে রেখে বলল,

"তুমি বিয়ে করে নিবে। ভালো থাকবে। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর সুন্দর ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করবে। তাহলে নিশ্চয় ভাবছ। অসুস্থ হিয়া নামের মেয়েটা কাঁপতে কাঁপতে তোমার সেসব ছবিতে প্রতিক্রিয়া জানাবে। এবং গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়বে। এমন হবে না উমাইয়ের। আজকে এই আড়ালে কফির মগটা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মধ্যে আমাদেরও সব শেষ হয়ে যাবে।"

বাক্যের সমাপ্তিতে লম্বা করে কফিতে চুমুক বসাল হিয়া। উষ্ণতায় মেদুর অধরযুগল খানিকটা বিরক্ত হলো। উমাইয়ের দুঃখে হেসে ফেলল। অতি সন্তর্পণে মগটা রেখে উঠে দাঁড়াল। বিদায় পূর্বে দুজনের সহিত আবেগঘন বাক্য বিনিময় হলো না। হিয়া অশ্রু গিলে নিল। বেদনার ফলে চেহারার পেশিগুলো বিকৃত হলো। কিছু সম্পর্ক এভাবেই হয়তো অপূর্ণতায় পূর্ণতা পায়।

(***)

বর্তমান সমাজে মানুষজনের সংখ্যা যত কম হবে তত একটি পরিবারকে সুখী মনে করা হয়। জয়েন্ট ফ্যামিলি নামক শব্দটা সম্ভবত ডিকশিনারির একটা ছোট্ট অংশ হয়ে থেকে গিয়েছে। সকলে একত্রে মিলেমিশে থাকবে এমন দৃশ্য যেন বিরল। তবে এই যুগেও বড় পরিবার আছে। আর সেখানে মানুষ এখনও একে অন্যের অনুভূতি রক্ষা করে চলে। তাসবীর ফরাজী বংশের বড়ো সন্তান। যখন সে জন্মাল তখন মানুষ ভাবল এই বুঝি মামুন সাহেব ও আযম সাহেবের মধ্যে বিবাদের কারণ সৃষ্টি হলো। তবে সকলের ধারণা কয়েকদিন বাদেই ভুল প্রমাণিত হলো। দুই ভাইয়ের মধ্যে বন্ধন যেন আরো দৃঢ় হলো। মামুন সাহেবের বড় ছেলে তাসবীর। সবদিক থেকেই ছেলেটা বৃহৎ। বুদ্ধিতে, রূপে, গুণে এমনকি আদরেও। সে সকলের চোখের মণি। তাই তো মা, চাচি কারো ভালোবাসার কমতি তার জীবনে নেই।

কাউচের ওপর আরামসে ঘুমাচ্ছে জাম্বু। বিড়ালটাকে খাওয়াতে খাওয়াতে একেবারে গোল আলু বানিয়ে ফেলেছে তাসবীর। জেবার বাবা সজীব ও মামুন সেই ছোট্ট বেলার বন্ধু। দুই পরিবারের সকলের মধ্যে অগাধ মেলামেশা। কথা ছিল জেবাকে মামুন পুত্রবধূ করে এই বাড়িতে আনবে। তবে মাঝখান থেকে আযম সেই ইচ্ছা পোষণ করায় ছোট ভাইয়ের জন্য ভদ্রলোক আর বেশি কথা আগায়নি। জাম্বুর আরেক নাম গোল আলু জেবাই রেখেছে। বিড়ালটি এই মেয়েটাকে একটুও সহ্য করতে পারে না। অবশ্য এই কারণটা সকলের অজানা।

"জাম্বু মরে গেলি নাকি?"

তাসবীরের মা স্বপ্না বিড়ালের পেটে একটু স্পর্শ করল। এতে অবশ্য মার্জার মহাশয়ের ঘুম ভাঙলো না। স্বপ্না মুখ বিকৃত করে বলল,

"এটা ঘুমাতেও পারে। অথচ তার মালিককে দেখো সারারাত কাজ করে এখন বাসায় আসছে।"

উমাইয়েরের মা কণক পাশেই কাপড়ে সুতোর কাজ করতে ব্যস্ত ছিল। হুট করে হেসে বলল, "সকাল সকাল ছেলেটাকে কথা শুনিয়ে দিলে আপা।"

"তো কী করব।"

তাদের কথার মাঝে তাসবীর মায়ের পায়ের কাছে বসে পড়ল। অফিসে কাজ করে কেবল বাসায় ফিরল সে। অভিনয়ের সুরে বলতে লাগল,

"হে জননী, তোমার পুত্র সবেমাত্র কাহিল হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। দয়া করিয়া তাকে বাক্য দ্বারা প্রহার করিও না। ভীষণ ক্লান্ত সে।"

বাক্যের সমাপ্তিতে কণক হো হো করে হেসে উঠল। স্বপ্না ভ্রু কুঁচকে বলল, "অতিরিক্ত শরৎচন্দ্র পড়া হচ্ছে দেখছি। প্রেম জেগেছে নাকী মনে?"

তাসবীর ক্লান্ত শরীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি মহান জননী।"

"একটা থাপ্পড় খাবে। ঠিক করে বলো তো। কী হয়েছে? কাল রাতে ফোনে ওভাবে ম্যাসেজ করলে কেন যে এক মেয়েতে খুন হয়েছো।"

তাসবীর মুচকি হেসে বলল, "মা একজনকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তার কথা না বললে মন শান্তি পাচ্ছে না।"